৬

আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

আলেক্স এক্কা

ভারতীয় আদিবাসী ও আদিম জনগোষ্ঠী ভারতীয় জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নিয়ে গঠিত। সংবিধানে তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এটা তাদের বিশেষ অধিকার ও সুবিধা প্রদান করে। সরকারী ও বেসরকারী (এনজিও) উভয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনতালাভের পর থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আদিবাসীরা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে লাভবান হয়েছে কি-না এবং শাসন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটে দেশের কেন্দ্রীয় কাঠামোয় তাদেরকে ক্ষমতাপন্ন করে তোলা হয়েছে কি-না। এই অধ্যায় হচ্ছে আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের একটি সার্বিক পর্যালোচনা। এখানে প্রথমে দেশে আদিবাসীদের অবস্থা নিরীক্ষণ করে দেখা হয়েছে আর পরে মণ্ডলীসহ সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদিবাসী উন্নয়নের একটি পর্যালোচনাধর্মী মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে আদিবাসী ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া। পরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদিম বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে, অতীত ও বর্তমান ঘটনাপরম্পরার উপর ভিত্তি করে, ভারতে আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ভবিষ্যৎ ধারাসমূহ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১। *আজকের দিনে আদিবাসী উন্নয়ন*

আদিবাসী উন্নয়ন পরিস্থিতি যাচাই করে দেখার একটি উপায় হল, ড: রাম দয়াল মুণ্ডার সভাপতিত্বে দশম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০২-২০০৭) কালে 'তফসিলি উপজাতিদের ক্ষমতায়নে ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। প্রতিবেদনে আদিবাসী উন্নয়নের মূল্যায়ন করা হয়েছে সমাজের সমাজবাদী ধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে। প্রতিবেদনে আরও আলোকপাত করা হয়েছে সংবিধানের পঞ্চম ও দশম তফসিলের কাঠামোর নেপথ্য দর্শনের উপর। তবে প্রতিবেদনে এই দর্শনের বিপক্ষে বিপত্তি উঠে এসেছে তিনটি কারণে।

(ক) নতুন অর্থনৈতিক নীতি এবং তফসিলভুক্ত অঞ্চলসমূহ। এখানে আদিবাসীদের মত সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষে বলিষ্ঠ নিরাপত্তামূলক ভূমিকা থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে তাদের শোষণের দিকে সরে আসা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) অনাদিবাসীদের নিকট আদিবাসী ভূমির হস্তান্তর। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বিরুদ্ধে সামাথা (Samatha) ঘটনাটি হচ্ছে, কিভাবে রাজ্য পঞ্চম তফসিল ক্ষেত্রসমূহে এর নিজস্ব সাংবিধানিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করছে তার একটি সুস্পষ্ট নমুনা। শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলে, আদিবাসী ভূমিগুলো রাজ্য ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রকল্পের নিকট – যেমন খনি খনন, হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্প, কল-কারখানা এবং পর্যটন – আদিবাসী ভূমিগুলো হস্তান্তর করছে। ১৯৫১-১৯৯৫ এই সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মানুষকে সর্বোপরি বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ হচ্ছে আদিবাসী। আর বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে মাত্র

এক-চতুর্থাংশকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

(গ) তফসিলভুক্ত অঞ্চলসমূহে আইন–শৃঙ্খলা। আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে চরমপন্থা, সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক গোলযোগ হচ্ছে শোষণ বা অবহেলার ফসল। সাধারণ জঙ্গী দলগুলোই চরমপন্থা, সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক গোলযোগের নেপথ্যে থাকে। তাই, রাষ্ট্রের আশু কর্তব্য আদিবাসী জনগণের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করা এবং কোন পরিস্থিতির সঙ্গে আপোসে না আসা, যেমন এ্যাডহক আইন এবং শৃঙ্খলা সমস্যা। সশস্ত্র বাহিনী বা পুলিশ ব্যাটেলিয়ন দিয়ে অঞ্চলগুলো শাসন সহিংসতা বা অশান্তির সমস্যার সমাধান বয়ে আনতে পারে না। একইভাবে, পুলিশ কর্তৃক সন্ত্রাস প্রতিরোধ আইনের (POTA) অপব্যবহার আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে নকশালবাদের প্রশয়দানে রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষেই কথা বলে।

আজকের আদিবাসী পরিস্থিতি উদাহরণ হিসেবে ক্ষুদ্রতমদের দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ এখনো শিকার ক'রে কিংবা জুম চাষের মাধ্যমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। রয়েছে দাসের ন্যায় চুক্তিবদ্ধ আদিবাসী শ্রমিক, যাদেরকে দেখা যায় তামিলনাড়ুর কফি ক্ষেতে এবং ঝাড়খণ্ডের দালতনগঞ্জ ও গিরিধিতে। আর যারা উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে পাথর আহরণ কাজে নিয়োজিত আছে, তাদের কথা নাই-বা বলা হল। সাক্ষরতা এবং শিক্ষা উন্নয়নে বড় ধরনের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও এটা কমে আসছে। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় গড় সাক্ষরতা হার শতকরা ৫২.৬ ভাগের বিপরীতে তফসিলি উপজাতিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা প্রায় ২৯.৬ ভাগ। তফসিলি উপজাতি নারীদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী অশিক্ষিত। এই বৈষম্যের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে তারা উচ্চহারে ঝরে পড়ছে, যে কারণে উচ্চতর শিক্ষায় তফসিলি উপজাতিদের উপস্থিতি সামঞ্জস্যহীনভাবে কম। অবাক হওয়ার কিছু নেই, ক্রমপুঞ্জিত ফলটি হল এই যে, দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত তফসিলি উপজাতিদের অনুপাত জাতীয় গড়ের থেকে অনেকগুণ বেশী। পরিকল্পনা কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, ১৯৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ৫১.৯২ ভাগ গ্রামীণ এবং শতকরা ৪১.১৪ ভাগ নগর তফসিলি উপজাতির দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস ছিল, মোট জনংসখ্যার সঙ্গে তুলনায় এ হার গ্রামে শতকরা ৩২.৩৬ ভাগ এবং নগরে শতকরা ৩৭.২৭ ভাগ।

২। সরকারি মধ্যস্থতাসমূহের মূল্যায়ন

আদিবাসীদের উন্নয়নে সরকারি মধ্যস্থতা ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ফলাফল বহন করে। তথাপি, একটি সূক্ষ্ম মূলায়ন, যে জন্য প্রয়োজন একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, তুলে ধরবে যে, আদিবাসী নীতিমালা ও কার্যক্রমগুলোয় কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ অপেক্ষা অনেক জনবিরোধী দিক বিদ্যমান।

আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ

ভারতীয় সংবিধানে আদিবাসীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে অনেক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। চার প্রধান শিরোনামে প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যেতে পারে : (১) নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ (ধারা ১৫, ১৬, ১৯, ৪৬, ১৪৬, ৩৪২, ইত্যাদি); (২) উন্নয়নমুখী ব্যবস্থাসমূহ (ধারা ৪৬, ২৭৫, ইত্যাদি); (৩) প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ (ধারা ২৪৪ এবং ২৭৫) এবং (৪) আসন-সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাসমূহ (ধারা ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪০, ইত্যাদি)। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ সামাজিক অন্যায্যতা ও সব ধরনের শোষণ থেকে আদিবাসীদের নিরাপত্তাবিধান করে, যখন উন্নয়নধর্মী ব্যবস্থাসমূহ তফসিলি উপজাতি ও তফসিলি জাতিদের ন্যায় দুর্বল শ্রেণীর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিশেষ যত্নের সাথে বিস্তার ঘটায়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ রাজ্যকে আদিবাসী অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তাবিধান ও শাসনে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে আর আসন-সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাসমূহ তফসিলি উপজাতি ও তফসিলি জাতিদের আইন পরিষদে এবং সরকারি চাকুরিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে।

আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও

পরিকল্পনা বিন্যস্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়, রাজ্য সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগকে সমর্থন যোগানো ও সম্পূরণ করা, আর তফসিলি উপজাতিদের পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে সূক্ষ্ম ব্যবধানগুলো পূরণ করার জন্য। এগুলো তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অপরাধ দমন) আইনের আওতায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ এবং সরকারি কর্মসংস্থান ও শিক্ষায় ইতিবাচক বৈষম্যের নীতিমালাসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে গঠিত। এ সকল প্রকল্পের অধিকাংশই আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত আর বাস্তবায়িত হয় রাজ্য সরকারের মাধ্যমে। এখানে প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হল।

(ক) আদিবাসী উপ-প্রকল্পের জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা। এর মূলত লক্ষ্য এ সকল খাতে পরিবামুখী আয়বর্ধক প্রকল্প, যেমন : কৃষি, উদ্যান, মাটি সংরক্ষণ, গবাদিপশু পালন, বন, শিক্ষা, সমবায়, মৎস্যচাষ, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, এবং অবকাঠামো উন্নয়ন।

(খ) ২৭৫(১) ধারার আওতায় বিভিন্ন অনুদান। এই অনুবিধির আওতায়, রাজ্য সরকারগুলোকে তবহিল ছাড় দেওয়া হয় এ ধরনের প্রকল্পের ব্যয় মেটানোর জন্য, যেমন : তফসিলি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছেলে ও মেয়ে হোস্টেল, আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা অঞ্চলগুলোতে আশ্রম স্কুল, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ।

(গ) TRIFED (The Tribal Cooperative Marketing Federation of India Ltd/ভারতীয় আদিবাসী সমবায়ী মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড)– এ বিনিয়োগ। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এর লক্ষ্য হল ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসায়ী ও দালালদের শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার পাশাপাশি তফসিলি উপজাতিদের ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনের জন্য লাভজনক দাম বা মূল্য প্রদান।

(ঘ) আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে নারী সাক্ষরতা উন্নয়নে কম সাক্ষর এলাকাগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। ১৯৯৩-১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি রাজ্যগুলোর সহায়তায় বিভিন্ন এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর কর্মপরিধি ১১টি রাজ্যের ১৩৬টি জেলা, এ সকল জেলায় ১৯৯১ আদমশুমারী অনুযায়ী তফসিলি উপজাতি নারীদের মাঝে স্বাক্ষরতার হার ছিল শতকর ১০ ভাগের কম। এর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত আদিম আদিবাসী দলগুলোর (PTGs) কন্যা শিশুরা। মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহায়তা যোগায় আর রাজ্য সরকারগুলো প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করে।

(ঙ) তফিসিলি উপজাতিদের জন্য অন্যান্য প্রকল্প ও কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্গত হল বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ শস্য ভাণ্ডার, PTG-দের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন, গ্রন্থাগার, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোচিং-এর সুযোগ, স্কলারশিপের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, একটি জাতীয় তফসিলভুক্ত আদিবাসী অর্থ ও উন্নয়ন কর্পোরেশন (NSFDC) প্রতিষ্ঠা, এবং দারিদ্র দূরীকরণধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রম।

বাস্তবায়ন কোথায় ?

আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যভিত্তিক গণ্ডা গণ্ডা কার্যক্রমের জন্য কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের প্রকল্পসমূহের প্রভাবের কথা বাদ দিলে, বলা যায়, তহবিলগুলোর যথাযথ ব্যবহার ব্যয় ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে। নীচের টেবিলটি ২০০১-২০০২ খ্রীষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ডের একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে ৬০.৬২ কোটি টাকা (ব্যয়ের শতকরা ১৭.৮ ভাগ) নির্ধারিত দপ্তরগুলোতে অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের চিত্র রাজ্য সরকারগুলোর পক্ষে কার্য-সম্পাদন না করার পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়।

ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যায়, যেখানে আদিবাসী জনসংখ্যা লক্ষ্য করার মত, গ্রামীণ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একজন হতাশই হবেন এটা লক্ষ্য করে যে, সরকারি মধ্যস্থতার এমনকি ৫০ বছর পরও, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রকট দরিদ্রতা, অপুষ্টি ও অশিক্ষা, ক্ষুধা, ব্যাধি, উচ্চ রুগ্নতা ও মৃত্যু হার, এবং শোষণের মধ্যে বসবাস। স্কুলভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পঞ্চায়েত ভবন এবং সড়ক, সেতু, কুয়ো ও হাতকলের ন্যায় অবকাঠামোগুলো জরাজীর্ণে পরিণত হয়েছে অথবা যেন-তেনভাবে দেখাশোনা করা হয় কিংবা এগুলোর

২০০১-২০০২ পরিকল্পনা ব্যয় ও খরচ, ঝাড়খণ্ড সরকার
(কোটি টাকায়)

দপ্তর	ব্যয়	খরচ	অব্যবহৃত
১। কৃষি ও সমবায়	৬৫.৮৫	৫১.৯১	১৩.৯৫
২। পশুপালন ও মৎস্যচাষ	১০.৭০	৮.৭৩	১.৯৭
৩। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা	১১২.৫০	৬৬.৩৭	৪৬.১৩
৪। পিডব্লিউডি (সড়ক)	১০.০০	১০৮.৭২	৮১.২৮
৫। পিডব্লিউডি (ভবন)	৪৪.৩১	১১.৮৬	৩২.৪৫
৬। গণস্বাস্থ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং	১৪০.০০	৫৮.৬৪	৮১.৩৬
৭। পল্লী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান	১১৬২.৪৬	৯৫৮	২০৪.৩৯
৮। কল্যাণ	৩৪০.০২	২৭৯.৪০	৬০.৬২

অস্তিত্বই নেই। প্রধান সমস্যা কিন্তু অর্থের আকাল নয়, কিন্তু হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং বিভিন্ন দপ্তর ও কর্মকর্তাদের বাস্তবায়ন দক্ষতা। দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাবও সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের তহবিল অপচয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। সোজা ভাষায় বলতে, সরকারের অদক্ষতা, আমলাতান্ত্রিক অসাড়তা এবং রাজনৈতিক উদাসীনতা আদিবাসী জনগণকে অনুন্নত রেখেছে এবং সব ধরনের উৎপীড়ন-নিপীড়নের দ্বার খুলে দিয়েছে।

সরকারের জনবিরোধী নীতিমালা

রাষ্ট্র ক্রমশ বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণীগুলোর প্রতি তার কল্যাণমুখী দায়িত্ব থেকে সরে এসেছে। এর প্রমাণ মেলে বেশ কিছু জনবিরোধী নীতিমালা থেকে। বিষয়টা অত্যন্ত ব্যাঙ্গাত্মক যে, একদিকে ভারত যখন এশীয়ার একটি অর্থনৈতিক বিস্ময় দেশ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, তখন দুর্বল শ্রেণীগুলোর বেশীর ভাগ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণের বিরূপ শিকারে পরিণত হচ্ছে, যেমন :

❑ **ভূমি অধিগ্রহণ সংশোধনী বিল ১৯৯৮।** এই বিল সরকারের হাতকে আরও শক্তিশালী করেছে, যখন ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধনীর মতই ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৯৯৪ আগে থেকে যথেষ্ট খারাপ ছিল, কেননা এ আইন যেমন 'বিশিষ্ট এলাকা' নীতিকে সমর্থন করেছে, তেমনি সরকারকে জনস্বার্থে যে-কোন ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছে।

❑ **পুনঃবসতি ও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় নীতি, প্যাকেজমালা এবং দিকনির্দেশাবলী ১৯৯৮** । বিলের অধিগ্রহণ অংশটি নিয়ে সংসদে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলেও, পুনঃবসতি ও পুনর্বাসন বিষয়ক দ্বিতীয় অংশটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা দলের বির্তক অর্জনে এমনকি ব্যর্থ হয়েছে।

❑ **আদিবাসী বিষয়ক খসড়া নীতি।** এ ধরনের কাজ এটা প্রথম হলেও, নীতিটি আদিবাসী পরিচয়, আদিবাসীদের অধিকার ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, এবং তাদের স্বশাসনের ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থার তাৎপর্য সম্পর্কে ভুলে ভরা। খসড়াটিতে সর্বোপরি পঞ্চম তফসিলের গুরুত্বের হানি ঘটানো হয়েছে, কেননা এ তফসিলিতে আদিবাসী ভূমিকে অনাদিবাসীদের নিকট হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং, সরকারি মধ্যস্থতার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে প্রকাশ পায় যে, প্রকল্পগুলো অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও, বাস্তবে আদিবাসীদের কল্যাণে এবং

তাদের জীবনমান উন্নয়নে এ সকল প্রতিশ্রুতি খুব কমই আলোর মুখ দেখেছে। সরকারের জনবিরোধী নীতিমালা এমনকি এও ইঙ্গিত করে যে, সরকার আসলে আদিবাসী জনগণের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সত্যিই আগ্রহী নয়। নীতিমালায় ইতিবাচক যত দিকই থাকুক না কেন, এগুলো সবই কাগুজে, যার নেপথ্য কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং বিরোধী সরকার-পদ্ধতি।

৩। এনজিওগুলোর প্রভাব

এনজিও অর্থ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। কারো কারো নিকট এনজিও শব্দটি এর নেতিবাচক পরিভাষা বা নামকরণপদ্ধতির দরুণ অসঙ্গত। তাই তারা অন্য কোন নাম ব্যবহার করেন, যেমন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (VOs), স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্প (VA) এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (VAs)। উন্নয়নের সকল উদ্যোগগুলো সরকার বা বাজারের তরফ থেকে নয়, কিন্তু নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেই। এগুলো স্বেচ্ছাসেবী খাতের অন্তর্গত। পরিকল্পনা কমিশন অনেক আগেই আদিবাসীদের উন্নয়নে এনজিওগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এনজিও ও স্বেছাসেবী প্রতিষ্ঠান পাঁচ প্রকার।

(ক) **ত্রাণ কার্য।** ভূমিকম্প, খরা, বন্যা বা মহামারীর ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও কল-কারখানায় দুর্ঘটনার ন্যায় মানব বিপর্যয়ে আক্রান্তদের মানবহিতৈষী সাহায্য হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও ওষুধ দেওয়া হয়। ত্রাণকার্য হচ্ছে, মানব দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে একটি সাময়িক পদক্ষেপ।

(খ) **দয়াধর্মী কাজ।** অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অক্ষম, অসুস্থ এবং পরিত্যক্ত বা অনাথ দয়াধর্মী কাজের উপর নির্ভরশীল। হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিশু ভবন, বর্ষীয়ান, অনাথদের জন্য হোম, সেবাসদন প্রভৃতি হচ্ছে দয়ামূলক কাজের দৃষ্টান্ত।

(গ) **কল্যাণমুখী কাজ**। সামাজিক মন্দতা প্রতিকার এবং মানব মর্যাদা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, কিছু কল্যাণমুখী কাজ একান্ত আবশ্যক। তাই সতী প্রথার বিরুদ্ধে কাজ করা, বিবধা বিবাহ সমর্থন করা, পতিতাদের জন্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা, পথশিশুদের দেখাশোনা করা এবং দুর্বল শ্রেণীগুলোর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা, এগুলোকে কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড বলা যেতে পারে।

(ঘ) **উন্নয়নমুখী কাজ।** এর অর্থ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ততা এবং জীবন মানের উন্নয়ন। এনজিওগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আত্ম-কর্মসংস্থান, নিজেরা করি দল ইত্যাদির মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণীর মাঝে উন্নয়নমুখী কাজ করাটা বেছে নিতে পারে। উন্নয়ন কার্যক্রমের আরও একটি দিক হচ্ছে, বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে নিয়োজিত হওয়া।

(ঙ) **সামাজিক কাজ।** মধ্যস্থতার আরও একটি দিক হল, সামাজিক কাজ। সামাজিক কাজের লক্ষ্য হল, সমাজে আমূল পরিবর্তন সাধন। সাধারণত সামাজিক কাজের সাথে জড়িত দলগুলোকে বলা হয় জনগণের সংগঠন বা গণ আন্দোলন। আর যারা সামাজিক কাজে নিয়োজিত তাদের বলা হয় সমাজকর্মী বা পরিবর্তন-কর্মী। তারা কাজ করেন দরিদ্র, শোষিত ও নিপীড়িতদের মাঝে আর লোকদের উদ্বুদ্ধ করেন অন্যায্য কাঠামোর বিরুদ্ধে এবং ন্যায়বিচার, সমতা ও মানব মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করে যেতে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কিছু উদাহরণ হল : নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, অন্ধ্রপ্রদেশের সামাথা (Samatha), মহারাষ্ট্রের ওয়ার্লি আদিবাসীদের Kashthkari সংগঠন, ঝাড়খণ্ডে নেতারহাট আন্দোলনের জান সংগ্রহ সমিতি। সামাজিক কাজের মধ্যে অন্তর্গত গণ-সচেতনতা, শিক্ষা, সংগঠন, ক্ষমতা ইত্যাদি।

এ সকল পদ্ধতি বা কার্যক্রমের প্রতিটির বিশেষ গুরুত্ব লক্ষণীয়। অনেক সময় এগুলোকে উন্নয়ন কাজের একটি সাধারণ শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, প্রতিটি কার্যক্রম ভিন্ন এবং অপরিহার্য। তবে অধিকাংশ এনজিও/ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন(VOs)

উপরোক্ত চারটি কার্যক্রমের একটি বা ততোধিক কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কম সংখ্যক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমাজের রূপান্তরসাধনে সামাজিক কাজ মধ্যস্থতার সাথে জড়িত। এই পদ্ধতি অন্যায্য কাঠামোসমূহ তুলে ধরে এবং লোকদের তাদের অধিকার আদায়ে পরিচালনা যোগায়। এটা নিজেদের সম্পদ ও জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় তাদের ক্ষমতাপন্ন করে। এ সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা এনজিওগুলো আদিবাসী উন্নয়নে আদিবাসীদের সঙ্গে ও তাদের জন্য কাজ করাকে একটি সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। একই কথা আদিবাসী মানবাধিকারের জন্য আদিবাসী ক্ষমতায়ন ও মধ্যস্থতা সম্পর্কে বলা যেতে পারে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (VO)বা এনজিওগুলোর SWOT ব্যাখ্যা

সমাজে এগুলোর স্থান নিশ্চিতকরণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা এনজিওগুলোর **শক্তি** (*strengths*), **দুর্বলতা** (*weakness*), **সুযোগ** (***o****pportunities*) ও **হুমকি** (***t****hreats*) (সংক্ষেপে SWOT) সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন :

এনজিওগুলোর **শক্তি** হল, এগুলো জনসাধারণের, অর্থাৎ দরিদ্র, প্রান্তিকশ্রেণী এবং নিপীড়িত শ্রেণীর অনেক কাছের। প্রতিটি ক্ষেত্রে এগুলো পুঞ্জিভূত করেছে মোটা রকম অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, যা নতুন নতুন মডেল, নীতিমালা ও পালনের জন্য সম্পদ হিসেবে কাজ করতে পারে।

এনজিওগুলোর একটি **দুর্বলতা** হল, এগুলো বাইরের তহবিলের উপর খুব বেশী নির্ভরশীল। এগুলোকে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার করে তোলা ছাড়াই, অনেক সময় এনজিও খুলে বসা একটি ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। অনেক এনজিওর প্রধান লক্ষ্য জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা। এগুলো অনেকটা দোকানের মত তহবিল এজেন্সিগুলোর সাহায্যে ব্যবসা করা।

আর **সুযোগের** ব্যাপারে বলা যায়, আজকে খুব বেশী মেরুপ্রবণ, নিপীড়িত ও মানবিকতাহীন জগতে তাদের উদ্যোগ, অঙ্গীকার ও কাজের উপর নির্ভর ক'রে এনজিওগুলো প্রচুর পরিমাণে সুযোগের অধিকারী।

সবশেষে, **হুমকি** ঘাপটি মেরে আছে বিশ্বায়ন ও উদারনীতিকরণ এবং ধনী ও ক্ষমতাশালীদের নীতিমালা দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার মধ্যে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অহংবোধ সমস্যা এবং সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হুমকির আরও কিছু উদাহরণ, যেগুলোর ব্যাপারে এনজিওগুলোকে সচেতন থাকতে হবে। আদিবাসী উন্নয়নে এনজিওগুলোর কাজের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন আমরা জানতে পারব এই আলোচনার শেষ অংশে।

মণ্ডলীর ভূমিকার মূল্যায়ন

জনসাধারণের দৃষ্টিতে, উন্নয়নে – আদিবাসী উন্নয়নসহ – মণ্ডলীর ভূমিকা যে নামে পরিচিত, তা হল খ্রীষ্টান মিশনারী। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রান্ত পর্যায়ের সমাজগুলোর কল্যাণ ও উন্নয়নে মণ্ডলী যে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে তা সরকার এবং এনজিও উভয় স্বীকার করে। মণ্ডলীর মধ্য থেকে আদিবাসী উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, বলা যায় যে, এ কাজটি তার নিজস্ব সামাজিক শিক্ষা অনুসারেই, তবে একই সঙ্গে দেশের উন্নয়ন কাঠামো ও ভাবাদর্শের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই, করা হয়েছে।

আদিবাসী উন্নয়নে মণ্ডলীর সম্পৃক্ততা বহুমুখি আর আদিবাসী কল্যাণের কথা বলতে গেলে সকল দিকের সাথে জড়িত, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কারিগরী উন্নয়ন, সমবায়, নিজেরা করি দল, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং মানবাধিকার বিষয়সমূহ। জায়গার স্বল্পতার কারণে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্ভব না হলেও, গুরুত্বপূর্ণ হল, আদিবাসী উন্নয়নে মণ্ডলীর ভূমিকার একটি সার্বিক মূল্যায়ন। তাত্ত্বিক মূল্যায়নের চেয়ে, সম্প্রতি ছত্রিশগড়ে পরিচালিত গবেষণা থেকে মণ্ডলীর ভূমিকার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হবে।

যে পাঁচটি ক্ষেত্রকে বিবেচনায় আনা হয়েছে, তা হল প্রাথমিক, অনানুষ্ঠানিক ও পেশাগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে মা ও শিশুর জন্য, আয়বর্ধন, নারী উন্নয়ন এবং মানবাধিকার বিষয়সমূহ। সারা রাজ্যের ৪০০ জন উত্তরদাতার পক্ষে মণ্ডলীর ভূমিকার প্রধান প্রধান মূল্যায়নগুলো লক্ষ্য করার মত :

(১) অনেক বিষয়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধা সাধারণত অধিকহারে পছন্দ করা হয়। অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, মণ্ডলী পরিচালিত স্কুলগুলোর চেয়ে তারা

সরকারি স্কুলগুলো থেকে উপকৃত হয়েছেন, শুধুমাত্র চাকুরির দিক থেকে নয়, কিন্তু মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সচেতনতা এবং আদিবাসী সংস্কৃতি ও পরিচয়ের পৃষ্ঠপোষকতার দিক থেকেও। সরকারি স্কুলগুলো সাধারণের পছন্দের প্রধান কারণ হল, এগুলোর সান্নিধ্য এবং সাধ্যতা। সিদ্ধান্ত হল এই যে, মিশন স্কুলগুলো যেমন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারেনি তেমনি বলা যায়, এগুলো ব্যয়বহুল। তবে, মানসম্পন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশন স্কুলগুলো সব সময় পছন্দের তালিকায়। উত্তরদাতাগণ এ সকল খাতে সরকার ও মণ্ডলীর স্ব স্ব অবদানকে একইভাবে মূল্যায়ন করেছেন ঃ স্বাস্থ্য বিষয়াদি, আয়বৃদ্ধি এবং নারী উন্নয়ন; সরকারি সুযোগ-সুবিধা জনগণের উপকারে এসেছে, তবে মিশনের মানসম্পন্ন সেবা পছন্দের তালিকায়।

(২) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে এনজিওগুলো অনেক ভাল করছে।

(৩) ছেলেমেয়েদের দক্ষতা-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মণ্ডলীর প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলগুলো অনেক কার্যকর।

(৪) স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে রায়গড় আম্বিকাপুর হেলথ্ এ্যাসোশিয়েসন রাহা (RAHA) কার্যক্রম বা পদ্ধতি অনন্য। এর দর্শন হচ্ছে একটি রুচিবান, টেকসই, দায়িত্বশীল ও রূপান্তরিত জনসমাজ। এটা জননন্দিত।

(৫) টেকসই কৃষিকাজের জন্য সিআরএস কার্যকক্রম বেশ কার্যকর। আম্বিকাপুর ও রায়গড় ধর্মপ্রদেশ দু'টিতে, টেকসই কৃষিকাজের জন্য সম্পদের ব্যবহার সবজি চাষ ও বৃক্ষ রোপনকে ভিত্তি ক'রে কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে আশাব্যঞ্জক লাভের মুখ দেখিয়েছে। সিআরস এছাড়াও জলবিভাজিকার জলাধার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণকে পথ দেখিয়েছে।

(৬) মণ্ডলী পরিচালিত নিজেরা করি দল SHGs এবং নারী সংগঠন সমানভাবে কার্যকর। রায়পুর ধর্মপ্রদেশের জেলাগুলোতে ডজন ডজন নারীদের নিয়ে গঠিত SHGs এবং সমবায় সমিতির গঠন দৃষ্টান্তমূলক। আত্মনির্ভরশীলতা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি আর্থ-সামাজিক মধ্যস্থতা হিসেবে এটা বেশ কার্যকর।

তাই বলা যায়, প্রশংসনীয় হলেও, আদিবাসী উন্নয়নে মণ্ডলীর ভূমিকা সন্তোষজনক অবস্থা থেকে এখনও বহু দূরে। মণ্ডলীকে শুধুমাত্র উন্নয়ন কাজে নয়, ন্যায্যতা ও মানবাধিকার বিষয়সমূহের ক্ষেত্রেও বেশী করে বহির্দৃষ্টিমুখী, পথ-প্রদর্শক এবং সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তার আরও কাজ হল, খ্রীষ্টান ও অনাদিবাসী খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে দূরত্ব সে রচনা করেছে, তার মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা; অগণিত আদিবাসী নারী যারা শহর-নগরে গৃহ-পরিচারিকা হিসেবে ভীষণভাবে নিপীড়িত হচ্ছে, তাদের জন্য তার রয়েছে বিশাল দায়িত্ব।

৫। আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন

বিখ্যাত ৭৩তম ১৯৯৩ সংবিধান সংশোধন থেকেই ভারতে আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার শুরু বা পথ চলা। এই সংশোধনীর নেপথ্য কারণগুলো ছিল দেশে অনেকাংশে অকার্যকর পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় স্বশাসনের যে আদিবাসী ব্যবস্থা তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর আবশ্যিকতা। পঞ্চায়েত (PESA বা Extensions to the Scheduled Areas Act, 1996) ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাগুলোকে এইভাবে আইনসম্মত করে তোলা হয় এবং যে সকল রাজ্যে পঞ্চম তফসিল অঞ্চলগুলোর অবস্থান, সেগুলোকে এক বছরের মধ্যে

গ্রহণযোগ্য আইন পাশ করানোর কথা বলা হয়। এ সকল আইনী দিকসমূহের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে স্বশাসনের ঐতিহ্যবাহী কাঠামোগুলো স্বীকার করা এবং এ সকল কাঠামোকে বিশেষ করে গ্রাম্য সভার মাধ্যমে স্থানীয় স্বশাসনের বিভিন্ন ইউনিটে রূপান্তরিত করা।

এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল : (১) পঞ্চায়েত ভিত্তিক রাজ্য আইন-ব্যবস্থা প্রচলিত আইন, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সামাজিক সম্পদ ও বিরোধ মীমাংসার সনাতনী প্রথাগুলোর সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া। (২) সমাজ হবে গ্রাম সভার কেন্দ্রপীঠ। (৩) গ্রাম সভার হাতে থাকবে ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্ব : সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও প্রকল্পের অনুমোদন; দারিদ্র বিমোচনের জন্য উপকারভোগীদের নির্বাচন; (৪) প্রকল্পের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পরামর্শ নেওয়া; ছোটখাট জলজ প্রাণী, খনিজ ও বনজ সামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ; নিষেধাজ্ঞা বলবৎকরণ; স্থানীয় বাজারগুলোর ব্যবস্থাপনা ও সুদে কারবারীদের প্রতিরোধ, ইত্যাদি।

আদিবাসী স্বশাসনের প্রচলিত প্রথার ব্যাপারে বলা যায়, অনেক রাজ্য আইন, বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডে, কেন্দ্রিয় PESA আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানে পরিচালিত গবেষণা থেকে যেমনটি বেরিয়ে এসেছে, বেশীর ভাগ মানুষ গ্রাম সভার ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এর স্থানের ব্যাপারে অবগত নয়। পঞ্চম তফসিল অঞ্চলসমূহে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত কি-না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। প্রয়োজন নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোর মধ্যে পদস্থ কর্মকর্তা ও অ-পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়সাধন।

গ্রাম-সভার কিছু সাফল্যগাঁথা আছে, উদাহরণ হিসেবে মহারাষ্ট্রের মেন্ধা-লেখা (Mendha-Lekha)গ্রামের বলা যেতে পারে। এই অঞ্চলে উন্নয়নজনিত বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে, সেখানে জঙ্গল বাঁচাও, মানব বাঁচাও, আন্দোলন শুরু করা হয়। মেন্ধা-লেখার দেবজী টপ্প এবং (বাধ বিরোধী আন্দোলনের) মোহন হিরাবাঈ নিজেদের জীবন, সংস্কৃতি ও জীবিকাকে প্রভাবিতকারী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলকে উৎসাহিত করেছিলেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, জনগণ দায়িত্ব গ্রহণে সামর্থ্যের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত স্বশাসনের দাবিকে বৈধ বলা যেতে পারে না। অচিরেই তাদের মধ্য থেকে মদাসক্ততা দূরীকরণের কতকগুলো আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় আর গড়ে তোলা হয় গ্রাম সভা।

আজও সেখানে ঘন ঘন গ্রাম-সভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর বিভিন্ন কমিটি নানা রকম দায়িত্ব সম্পাদনে নিয়োজিত, যেমন গ্রাম উন্নয়ন কমিটি, মহিলা মণ্ডল, বন রক্ষা কমিটি ইত্যাদি। গ্রাম-সভার রয়েছে সে অঞ্চলের বন ও অন্যান্য সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ। এটা এর নিজস্ব কল্যাণমুখী ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থ যোগাড় করে। গ্রাম-সভায় নারীদেরও ন্যায়সঙ্গত স্থান আছে। মেন্ধা-লেখা অভিজ্ঞতা অনুসরণীয়, তবে প্রয়োজন দেবজী টপ্প ও মোহন হীরাবাঈ-এর মত কয়েকজন উদ্যমী মানুষ, যারা এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবেন। মেন্ধা-লেখার গ্রামবাসীদের মত গোটা গ্রামকে গ্রাম-সভার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করতে হবে।

৬। আদিম জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত প্রশ্ন

ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে আদিবাসীও বলা হয়। এর অর্থ আদি বাসিন্দা, যা আদিবাসীদের আদিম বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে। কিন্তু ভারত সরকার 'আদিম জনগোষ্ঠী' শব্দদ্বয়টি মেনে নেয় না। আর এই অনাগ্রহ আদিবাসী জনগণের খোদ পরিচয়কে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে, কেননা তাদের দাবি হল, তারাই হচ্ছে দেশের প্রথম বাসিন্দা আর এই পদমর্যাদার ভোগ তাদের অধিকার। ভারত সরকার বার বার অস্বীকার করে এসেছে যে, দেশে কোন আদিম জনগোষ্ঠী নেই। কমপক্ষে দু'বার ভারতীয় প্রতিনিধিগণ জেনেভায় আদি জনগোষ্ঠী বিষয়ক জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপে ভারত সরকারের এই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন, মূলত এই যুক্তিতে যে, ভারতীয় আদিবাসী সমাজগুলো তাদের আদিম আদিবাসী বৈশিষ্ট্য আর বজায় রাখে না।

এ ধরনের বিবৃতি দু'টি সমস্যা উত্থাপন করে ব'লে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সানদারস্ যিনি ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে

জাতিসংঘ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। একদিকে, ভারতীয় প্রতিনিধি দাবি করেছেন যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে একীভূত করে তোলা হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে তিনি আদিবাসীদের জন্য গৃহীত বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের কথাও উল্লেখ করেছেন আর উত্তরপূর্ব ভারতের যে যে রাজ্যে সবচেয়ে বেশী আদিবাসী জনগণের বসবাস সেগুলোর কথাও বলেছেন। তাহলে, আদিবাসীরা আছে অথবা তারা নেই ! দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত ভাবনা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, একমাত্র যে সকল আদিবাসী তাদের 'আদিম' আদিবাসী সংস্কৃতি বজায় রেখেছে তারাই হচ্ছে সত্যিকার আদিবাসী। এ ধরনের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক মাপকাঠি যদি বিশ্বজনীনভাবে আদি জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে পৃথিবীর কোথাও "আদি জনগোষ্ঠী" থাকার কথা নয়। আদিম বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্যকে অভিযোজনের মাধ্যমে বিসর্জন দেয় না। তদসত্ত্বেও, আদিম জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকে, আর প্রশ্নটা মূলত: সামাজিক ন্যায্যতার জন্য আদিবাসী অন্বেষণকে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

ফার্ণান্দেজ ওয়াল্টারের মতে, আদিবাসীদের কেন তাদের আদিম মর্যাদা দেওয়া হয় না তার একটি কারণ হিসেবে, আদিম জনগোষ্ঠীর অধিকার আছে অপসরণ দাবি করার – এটা বুঝানোর জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সম্মেলনের একটি ধারাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, আদিবাসীরা যা দাবি করছে তা হল, আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বশাসন, আর সেই সাথে তাদের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, অপসারণ নয়। তাদের দাবি হল, তাদের যেন মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়, বিভিন্ন প্রকল্প যেগুলোর পরিকল্পনা প্রভাবশালী সিদ্ধান্ত-প্রণেতারাই করে থাকেন, সেগুলোর লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নয়।

৭। আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কোথায় ?

ভারতে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন একটি মিশ্র রূপরেখা প্রদান করে। সরকার আদিবাসীদের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদানের কথা বললেও, এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে এমনসব নীতিমালা সরকার প্রণয়ন করেছে যেগুলো আদিবাসীদের ন্যায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিপক্ষে যায়।

এ দিক দিয়ে এনজিওগুলো কিছুটা ভাল করলে বা এগিয়ে থাকলেও, প্রয়োজন আদিবাসী সমস্যা ও বিষয়গুলোকে আরও নিয়মিত ও সঠিকভাবে তুলে ধরা। অল্প কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা এনজিও, যেগুলোর তাদের ব্যাপক গণকেন্দ্রিকতার জন্য এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের সামর্থের জন্য সুনাম আছে, এগুলো বাদে অনেক বা অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা এনজিও উদাসীন ও রুটিনমাফিক কাজ করে যাচ্ছে, এবং প্রধানত নিজেদের স্বার্থ হাসিলে ব্যতিব্যস্ত।

মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলোও আদিবাসী উন্নয়নে তাদের নিজস্ব ভাগ দিয়ে অবদান রেখেছে, আর অনেক সময় শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য দানকর্ম, কল্যাণ ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রশংসা কুড়িয়েছে। তবে এগুলোরও প্রয়োজন আছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর নিকট উপস্থিত হওয়ার। সর্বোপরি এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে জন-ক্ষমতায়নের সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে, শুধুমাত্র দান, কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরাপদ ও নিরুদ্বেগ কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এই প্রেক্ষিতে, এগুলোকে অবশ্যই জাগতিক নাগরিক সমাজ দলগুলোর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অধিকতর আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করে যেতে হবে।

এ তিন প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ সরকার, এনজিও ও মণ্ডলী একত্রে মিলে আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেহেতু সরকারের হাতে সাংবিধানিক নানা সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ আছে, তাই এগুলোর বণ্টন প্রণালীকে এনজিও ও মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন। তবে পরিশেষে, জনগণকে তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে হবে। এনজিও ও মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র যা করতে পারে তা হল, দেশে আদিবাসীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের এই সার্বিক প্রক্রিয়াকে সহায়তা দান করা বা এগিয়ে নেওয়া।